বিড়াল

গাড়িটা স্টার্ট করে সুমনা ভট্টাচার্যি গাড়ির জানলা দিয়ে একবার হাত নাড়লেন। তারপর হুশ করে গাড়িটা সোজা রাস্তা ধরে বেরিয়ে গেল। গাড়িটা চলে যেতেই গেটের কাছে জমায়েৎ মানুষগুলোর হাবেভাবে বেশ একটা পরিবর্তন দেখা গেল। যেন মিলিটারি 'টেনশন' ছেড়ে আটপৌরে খোলামেলা জগতে ফিরে এলো সবাই।

সুরজিৎ পিঠটাকে টানটান করে একবার ঝাঁকানি দিয়ে গীতাকে বললো, "বাবলুকে শুইয়ে দিয়ে এসো, বেচারা আর দাঁড়াতে পারছে না।"

জেঠামশাই বললেন, "তা রাত তো কম হ'ল না! অন্য দিন কখন ঘুমিয়ে পড়ে।" গীতা বাবলুকে নিয়ে শোবার ঘরে চলে গেল। সুরজিতের বন্ধু ও সহকর্মী যে দু'জন এসেছিল তারাও আজকের ভূরিভোজনের ভূরি-ভূরি প্রশংসা জানিয়ে বিদায় নিলো।

ঘরে এসে জেঠামশাই একটা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। সুরজিৎ ফার্নিচারগুলো টানাটানি করে আবার রোজকার ধাঁচে সাজাতে লাগলো। গীতা বললো, "কাল রামভরোসেকে দিয়ে করিয়ে নেবো, ছেড়ে দাও।"

জেঠীমা বললেন, "সারাদিন কম খাটনি গেছে? এখন আর ওসব নিয়ে পড়িস না তো ! বসে একটু জিরিয়ে নে। একটু শরবৎ খাবি নাকি?"

"দাও।"

গীতা বললো, "তার মানে তুমি ভাল করে খাও নি।"

জেঠামশাই হেসে বললেন, "ভাল করে খাবে কি? Boss'এর তত্ত্বাবধান করতে হয়েছে ঝাড়া তিন ঘণ্টা ধরে। খাবার হুঁশ থাকে মানুষের?"

"জেঠামশাই, আপনি ঠিকমত খেয়েছিলেন তো?"

"হ্যাঁ মা, খুব তৃপ্তি করে খেয়েছি। প্রত্যেকটি রান্না অতি চমৎকার হয়েছিল।"

"বেশীরভাগই জেঠীমার হাতের গুণ। আমি যেগুলো রেঁধেছি তাও জেঠীমা দেখিয়ে দিয়েছেন।"

"মিসেস ভট্টাচার্যি খুব তারিফ করছিলেন", উদ্ভাসিত গলায় বললো সুরজিৎ, 'বিশেষ করে চিকেনকারি আর দইমাছ নাকি প্রাইজ পাওয়ার মত হয়েছে ওঁর মতে। ছানার পায়েসটাও ওঁর ভীষণ ভাল লেগেছে।"

"যাক, ভালোয় ভালোয় উৎরে গেছে সেই ঢের। তুই তো ভয়ই পাচ্ছিলি ওঁকে নেমতন্ন করতে। Boss বলে কথা।"

গীতা সবাইকে আর এক দফা পান বিলি করলো। বাজার থেকে খিলিপান কিনে এনেছিল সুরজিৎ। তার থেকে বেশ কিছু বেঁচে গেছে। রূপোর তবক দেওয়া সুগন্ধি পান। জেঠীমা বললেন, "হ্যাঁরে, সুমনা ভট্টাচার্যির একটা ছেলে আছে না? তুই বলেছিলি ওঁর স্বামী যখন মারা যায়, ছেলেটা তখন একেবারে বাচ্চা? মায়ের সঙ্গে থাকে না ছেলেটা?"

"খড়গপুরে ইন্জিনীয়ারিং পড়ে। ছুটিছাটায় আসে।" জেঠীমা একমনে পান চিবোচ্ছেন। সুরজিৎ উৎসুক চোখে জেঠীমার মুখের দিকে চেয়ে আছে পরবর্তী মন্তব্যের প্রতীক্ষায়।

"সত্যি ক্ষমতা আছে, একা একা এত রাতে গাড়ি হাঁকিয়ে গেল।"

"কত হিল্লিদিল্লী করে বেড়াচ্ছেন! বিদেশেও যেতে হয় মাঝেমাঝে। এইতো গেলবছর রাশিয়া ঘুরে এলেন।"

"আমাদের ইন্দিরা গান্ধীই কি কিছু কম নাকি?" আরেক খিলি পান মুখে পোরার আগে বলে নিলেন জেঠীমা। সুমনা ভট্টাচার্যির কৃতিত্ব জেঠীমাকে অভিভূত করেছে বোঝা গেল। ইন্দিরা গান্ধীকে দারুণ শ্রদ্ধা করেন জেঠীমা। ফট করে যাকে তাকে ওঁর পর্যায়ে ফেলেন না কখনো।

গীতার সত্যিই খুব খাটনি গেছে। শোবার অনতিপরেই ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুম নেই সুরজিতের চোখে। আজকের ভোজসমারোহের পিছনে খাটাখাটনি তাকেও করতে হয়েছে কম নয়। গত পাঁচ বছর সুমনা ভট্টাচার্যি তার ঊর্ধ্বতন অফিসার হয়ে বিরাজ করছেন। আজ এই প্রথম সুরজিতের বাড়িতে পদার্পণ ঘটলো তাঁর। নেহাৎ জেঠীমা ও

জেঠামশাই ঠিক এই সময় এখানে বেড়াতে এসেছেন। তাঁদেরই উৎসাহ ও পরামর্শে বাবলুর জন্মদিন উপলক্ষে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল মিসেস ভট্টাচার্যিকে। ভদ্রমহিলাও এককথায় চলে এলেন। সেদিক দিয়ে বেশ দিলদরাজ মহিলা। অফিসের কাজের ব্যাপারে কড়া হলেও ভারী সাবলীল বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার সকলের সাথে। যেটা কুশল পরিচালকদের একটা মস্ত গুণ।

মনের মধ্যে কি একটা মৃদু অসন্তোষ খোঁচা দিচ্ছে থেকে থেকে। ঠিক নাগাল পায়না সুরজিৎ। জেঠীমার মুখে সুমনা ভট্টাচার্যির স্তুতি শোনার কালে, নাকি তারও আগে যখন সুমনা ভট্টাচার্যি প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে জেঠীমাকে বলছিলেন, "আমি মুখে দিয়েই ধরতে পেরেছি যে এ পাকা হাতের রান্না ------ বহুকাল পরে এমন দইমাছ খেলাম", মনের গভীরে একটা অস্পষ্ট বিষন্ন অনুভূতির স্পন্দন অনুভব করেছিল সুরজিৎ।

জানলার বাইরে একটা বিড়াল ডেকে উঠলো --- মিঁয়াও, মিঁ--য়া--ও। সুরজিৎ বালিশটা কাত করে ঘাড় উঁচু করে জানলার দিকে মুখ ফেরালো। অন্ধকারে দৃষ্টি মেলে সে যেন অনেক বছর আগের এক পটভূমিতে দেখতে পেলো নিজেকে ----।

.

সুরজিৎ তখন রুড়কিতে পড়ে। গরমের ছুটিতে জেঠামশাইদের সঙ্গে ভোপালে বেড়াতে গেছে। জেঠতুতো ভাই সুনীলের কাছে। লেকের ধারেই বাড়িখানা। শামলা হিলের উপর। বিরাট বারান্দা। সেখানে বসে নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া যায়। লেকের মধ্যিখানে ছোট্ট একটা দ্বীপ। সেখানে আবার সিনেমার সুটিং চলছে তখন। এর মধ্যে শনি-রবিবার মিলিয়ে সুনীলের অফিসের গাড়ীতে সাঁচি ঘুরে এলো ওরা। এছাড়া ভোপালের দর্শনীয় স্থানগুলো, বাজারঘাট, এ সব তো দেখছেই আক্ছার।

নির্ঝঞ্ঝাট সচ্ছল জীবন সুনীলের। মোটা মাইনের সরকারী চাকরি করে। ওর স্ত্রী বেলা একটা খ্যাতনামা বেসরকারী স্কুলে পড়ায়। বাড়ির কাজের জন্যে মাইনে করা লোক আছে। কমলা নামে একটি বিধবা স্ত্রীলোককে জেঠীমাই কোলকাতা থেকে জোগাড় করে এনে দিয়েছেন

তাঁর চেনাপরিচিতদের মাধ্যমে। গত এক বছর ধরে এদের সংসারে সামাল দিয়ে এসেছে কমলা। এছাড়া বাইরের কাজ, বাজারহাট, ফাইফরমাস খাটার জন্যে আছে ছোকরা চাকর রামু। কমলার চেহারাটা এখনও পরিষ্কার মনে আছে সুরজিতের। কালো, সামনের দাঁতগুলো অসমান, কপালটা বেশ উঁচু মত। খুব আঁট করে চুল বাঁধার জন্যে আরও উঁচু দেখাতো কপালটা। পরনে কালোপেড়ে শাদা শাড়ি। মুখখানায় কেমন একটা দুঃখী-দুঃখী ভাব। উদয়াস্ত একনাগাড়ে খাটতো কমলা। ক্ষিপ্রহাতে একটার পর একটা কাজ করে যেতো ঘড়ির কাঁটার মত অভ্রান্ত নিয়মে।

ভোপাল যাবার দিন সাতেক পরের কথা। বেলা বলেছিল ওদের ওখানে নাকি বিড়ালের ভারী উৎপাত। মাছভাজা, ঝোলের মাছ, কোন ফাঁকে তুলে নিয়ে চম্পট দেয় টের পাওয়া যায়না।

জেঠীমা বললেন, "তোমাদের রান্নাঘরের জানলায় জাল দেওয়া, মশামাছি ঢুকতে পারেনা। রান্নাঘরের দরজা বন্ধ রাখলে বিড়াল ঢুকবে কোথা থেকে?"

বেলা অপ্রস্তুত হয়ে বলে, "আসলে কমলা, রামু, এরা দরজা বন্ধ করতে ভুলে যায়।" আমাদের সামনে কোনদিন বিড়াল আসতে দেখিনি, যদিও আমাদের নজর বাঁচিয়ে প্রায়ই দু'এক পীস মাছ সাবাড় করে গেছে নিয়মিত।

সেদিন রবিবার। সক্কালবেলা সুনীলদের অফিসের এক ভদ্রলোক একটা বড় ডিবে ভর্তি কাটা ইলিশমাছ দিয়ে গেলেন। ভদ্রলোক ছুটিতে কলকাতা গেছিলেন। অনেক যত্ন করে বরফ ঠরফ দিয়ে মাছ এনেছেন অতদূর থেকে। রবিবারে সুনীল এদের নিয়ে কোথাও বেরোবে কিনা তখনো ভেবে ঠিক করে নি। মাছগুলো দেখে বেলা বললো, "আজ আর এবেলা কোথাও গিয়ে কাজ নেই। গঙ্গার ইলিশ কতদিন খাইনি ! মাছ ভাজা, মাছের ভাপা আর গরম গরম ভাত করে দেবোখন বারোটার মধ্যে।"

"অর্থাৎ মাছটা আর বেশীক্ষণ রাখলে টেঁসে যাবে," রসিকতা করে সুনীল।

"না না, তা নয়। তবু শুধু শুধু আরও বাসি করে কি লাভ ! ট্রেনে

করে এই এতটা পথ পাড়ি দিয়ে এই গরমে ..... সত্যি তোমার ধীরেশ ধরকে ক্রেডিট দিতে হয়। গঙ্গার ইলিশ খাওয়াবে বলেছিল, ঠিক মনে করে এনেছে।"

বারান্দায় বসে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিল সুরজিৎ। তার চোখ দু'টো বারবার লেকের দিকে চলে যাচ্ছে। ভীষণ মোটা একটা লোক ছোট্ট একটা ডিঙ্গিতে বসে দ্বীপের দিকে যাচ্ছে। লিকপিকে সড়িঙ্গেমত একটা ছোকরা চালাচ্ছে ডিঙ্গিটা। ডিঙ্গি যদি উল্টে যায় আর ওই বিশালবপু আরোহী যদি সাঁতার না জানে ----- না জানার চান্সই ষোল আনা ----- তবে রোগা পটকা মাঝির সাধ্যি নেই ওকে জলে ডোবার হাত থেকে বাঁচায়। আশ্চর্য, এতটুকু সাধারণ বুদ্ধি নেই লোকটার? সাধ করে এরকম ঝুঁকি নেয় কেউ? ---- ভিতর থেকে ডাক এলো, "ভাত দেওয়া হয়েছে, খেতে এসো।"

স্বাদু মাছের লোভনীয় আঘ্রাণে সারাবাড়ি ভরপুর। নিঃশব্দে খেয়ে চলেছে সুরজিৎ। বেলা বললো, "আরও ভাত আছে। অমন কম কম করে খাচ্ছো কেন?"

জেঠামশাই বললেন, "জানো বৌমা, ধানবাদে আমাদের বাড়ি ছোট-বড়-মাঝারি নানান সাইজের ভাতের হাঁড়ি আছে। বাড়িতে ইলিশমাছ এলে সবচেয়ে বড় হাঁড়িতে ভাত রান্না হয়। আর যেদিন বাজারে মাছ ওঠেনা, সেদিন সব থেকে ছোট হাঁড়িতে রাঁধলেও ভাত পড়ে থাকে।"

সুনীল তৃতীয় দফা নিজের শূন্য পাতে মাছভাপা ও গরম ভাত পরিবেশন করে নিয়ে বলে, "ইলিশমাছ বলে কথা। তাও আবার কলকাতার ইলিশ। আমাদের লোকালমার্কা নকল মাল নয়।"

বেলা বললো, "সরি, ভাজামাছ কিন্তু মোটে একখানা করে। তিন পীস মাছ বিড়ালের পেটে গেছে আজ। একটু ডাল আর পটল ভাজা করলাম তাই।"

সবারই মনটা খারাপ হয়ে গেল। আহা এমন সেরা মাছের তিন তিনটে পীস এভাবে জলাঞ্জলি যাওয়ার চাইতে আফসোসের কথা আর কি হতে পারে ! গতস্য শোচনা নাস্তি, কিন্তু এরকম গাফিলতিও কি কম শোচনীয়?

খাবার পর সুরজিৎ একটু লম্বা হয়েছিল। সামান্য তন্দ্রামতন এসেছে সবে, হঠাৎ বাড়ির অন্য প্রান্ত থেকে বেশ একটা শোরগোল শুনে উঠে বসলো। কুলারের শব্দ ছাপিয়ে বকাবকির আওয়াজ ভেসে আসছে। ওদের বাড়িতে এ ধরনের গোলযোগের উপলক্ষ্য পারতপক্ষে ঘটেনা। সুরজিৎ শোবার ঘরের দরজা খুলে পাশের ঘরে এলো। তারপর আওয়াজের সূত্র ধরে বাড়ির একপ্রান্তে ছোট ঘরখানার দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। এ ঘরটা কমলার। দড়িতে খানকতক জামাকাপড় ঝুলছে। একপাশে একটা বাক্সের উপর দৈনিক ব্যবহার্য টুকিটাকি। গোটানো মাদুরখানা এককোনে দাঁড় করানো রয়েছে। ঘরের মধ্যিখানে একটা পিঁড়ির সামনে ওল্টানো থালা, গেলাস, খাবারদাবার ছত্রাকার হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। কমলা ঘরের এককোনে আঁচলে মুখ ঢেকে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে। বেলা, সুনীল ও জেঠামশাই হতভম্ব হয়ে মাটিতে ছড়ানো ভোজ্য বস্তুর দিকে তাকিয়ে আছেন আর জেঠীমা তুমুল তর্জনগর্জন করছেন।

"এই দ্যাখো তোমাদের বিড়াল! এই ইনিই বিড়ালের দোহাই দিয়ে রোজ মজাসে মাছ সাবড়াচ্ছেন। ছি ছি, বিধবা মেয়েমানুষের এত বড় নোলা! কি ঘেন্না, কি ঘেন্না!! এটা একটা ভদ্রপরিবারের বাড়ি, বুঝলে? এসব বেলেল্লাপনা চলবে না এখানে। আজই তোমায় টিকিট কেটে ট্রেনে তুলে দেবে। এবাড়িতে তোমার মত মেয়েমানুষের ছায়া পড়ুক এ আমি কিছুতেই বরদাস্ত করবো না। বাইরে এমন ভালমানুষটি সেজে থাকেন, কে জানতো ওনার পেটে পেটে এত!"

পরদিন সকালে সুনীল ও সুরজিৎ কমলাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এলো। সুরজিতের ভীষণ খারাপ লাগছিল। কিন্তু কি করবে, সুনীল বললো সঙ্গে যেতে। জেঠামশাই - জেঠীমাও চাইলেন ও সুনীলের সঙ্গে যাক। অতএব। স্টেশন যাওয়ার পথে গাড়িতে একটাও বাড়তি কথা বললো না কেউ। সুরজিতের ভয় ছিল কমলা হয়তো কিছু বলবে, নালিশ জানাবে, কাঁদাকাটি করবে। কমলা শুধু ওদের নজর বাঁচিয়ে বার কয়েক চোখ মুছলো। ওরা নির্লিপ্ত মুখে সামনের পানে চেয়ে রইলো। বাড়ি ফেরার পর কেউ আর কমলার কথা উত্থাপন করেনি। জেঠীমা - জেঠামশাই - বেলা - সুনীল কেউ না। আর সুরজিৎ তো নয়ই।

সেদিন ওই ঘটনার পর যে প্রশ্নগুলো সুরজিতের মনের মধ্যে ক্রমাগত ঘুরপাক দিচ্ছিল অথচ সুরজিৎ কিছুতেই সেই প্রশ্নগুলো জেঠীমা, জেঠামশাই, সুনীল, বেলাকে করতে পারেনি আজ এত বছর পর আবার তারা তাকে উত্যক্ত করে তুললো। সুরজিতের যখন দু'বছর বয়স, মাত্র ক'দিনের ব্যবধানে বাবা ও মা দু'জনেই মারা গেলেন। বাবা টেররিস্টের গুলিতে, আর মা বাবাকে হারানোর শোকে। তদবধি জেঠীমা, জেঠামশাই সুরজিৎকে বুকে করে মানুষ করেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধাচরণের কথা কল্পনাও করতে পারেনা সুরজিৎ, তা সে যত বড় অন্যায়ের প্রতিবাদেই হোক না কেন। তবে সেদিন তার মনে যে কথাগুলো তোলপাড় করেছিল, মুখ ফুটে বলতে না পারলেও প্রশ্নগুলো হারিয়ে যায়নি। মনের অভ্যন্তরে যত্ন করে তুলে রাখা ছিল। আজ অনায়াসে মনে পড়ে গেল। যেন পরিষ্কার হরফে লেখা তালিকাখানা হাতে তুলে দিল কেউ। প্রশ্নগুলো কতকটা এই ধরনের:- সেদিন বাড়িতে অত তুলকালামের কারণটা কি? কমলাকে ওরা নিরামিষাশী ভেবেছিল কিন্তু কমলা আসলে তা নয়। একটা সামান্য বোঝার ভুল শুধু। দু'পক্ষেরই। কমলা বলতে পারতো, "আমি কালোপেড়ে শাড়ি পরি বলে আপনারা যেন ভাববেন না আমি মাছ খাই না। আমি মাছ খেতে ভালবাসি।" কিংবা, "আমি ঠিক করেছি এবার থেকে মাছ খাবো।" যেদিন মাছ রান্না হ'ত বেলা রামুকে এক টুকরো করে মাছ দিতো। কমলারও প্রাপ্য ছিল সেটা। ওর প্রাপ্যটা আদায় করতে কমলাকে যে ঘুরপথের আশ্রয় নিতে হ'ল সেটা ওর অপরাধ নয়। বরং ওকে যে এই বাড়তি কষ্টটুকু পেতে হ'ল সেটাই তো দোষনীয় ! আমিষ বা নিরামিষ খাদ্যবিধি সংক্রান্ত যুক্তি তর্কের বিচার বিশ্লেষণে বসার ধৈর্য সুরজিতের সেদিনও ছিলনা, আজও নেই। তার প্রশ্ন হল সমাজের এইসব তথাকথিত নিয়মগুলো বলবৎ করতে কি 'লগুড়হস্তেন' জেঠীমাদেরই মাঠে নামতে হবে? জেঠীমারা অকথ্য অপমান করে কমলাদের দূর করে দিতে চাইবেন আর অমনি কমলারা নিঃশব্দে নতশিরে 'যথা আজ্ঞা' মেনে দূর হয়ে যাবে?

অথচ আজ সুমনা ভট্টাচার্যির পাতে যেচে মাছ-মাংস পরিবেশন করে ধন্য হলেন জেঠীমা। তাঁর মুখে নিজের রান্নার প্রশংসা শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। কমলা ও সুমনা ভট্টাচার্যির মধ্যে কি সেই প্রভেদ, যা জেঠীমার ব্যবহারে এমন আমূল পরিবর্তন এনে দিলো? ছোটবেলার পাঠ্যসূচী থেকে একটা সংস্কৃত শ্লোক মনে পড়ে গেল সুরজিতের ----

অশ্বম্ নৈব গজম্ নৈব ব্যাঘ্রম নৈব চ নৈব চ

অজাপুত্রম্ বলিম্ দদ্যাৎ, দেবো দুর্বলঘাতকঃ

অর্থাৎ শক্তিমানদের পারতপক্ষে কেউ ঘাঁটাতে চায়না। সামনে যূপকাষ্ঠ দেখে একটা কিছু বলি দিয়ে পূণ্যার্জন করার মহৎ আকাঙ্ক্ষায় যখন মন আনচান করে, নিরীহ ছাগল ছানাটার দিকেই হাত বাড়ায় মানুষ। বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে কাজটা চুকে যায়। দু'একবার অসহায় গলায় ব্যা - ব্যা ডেকে ধড়ফড় করে দিব্যি মরে যায়। আঁচড়ানো কামড়ানোর ধার দিয়েও যায়না। সমাজের হাড়িকাঠে বলি দেবার বেলাতেও তাই যারা অসহায়, রুখে দাঁড়ানোর শক্তি যাদের নেই, ইচ্ছেমত নিয়মকানুন বানিয়ে তাদের উপর হাতপাকানো যায়। তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায় যত অপক্ক, অসুস্থ, স্থবির মস্তিস্কের ফসল ----।